বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র থাকত, রবীন্দ্র-নজরুল থাকত। দস্যু মোহন সিরিজ, নীহাররঞ্জন গুপ্তের বই, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, এইসব লেখকের বই থাকতই। তারাশঙ্করের বই দেখেছি অনেক বাড়ির আলমারিতে। সুবোধ ঘোষের একটা বই দেখেছিলাম ওহাবদা'র বইয়ের আলমারিতে। নামটা এখনো আমার মনে আছে 'রূপসাগর'।

যদিও অভিভাবকরা কেউ কেউ মনে করতেন আউট বই কিংবা নভেল, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি অল্পবয়সে পড়লে ছেলেমেয়েরা বখে যায়, তারপরও বাড়িতে বইয়ের আলমারি একটা থাকত। বই থাকত। সেইসব বই পড়ে কেউ বখে গেছে বলে জীবনে শুনিনি বরং বইপড়া মানুষরাই সমাজ এবং দেশ আলোকিত করেছে।

ঢাকার জীবনেও একই দৃশ্য দেখেছি আমি। '৬৪ সাল থেকে গেণ্ডারিয়ায় বসবাস আমাদের। গেণ্ডারিয়া তখন ছিমছাম সুন্দর, নির্জন পরিচ্ছন্ন এলাকা। সামনে লনঅলা কী সুন্দর সুন্দর একেকটা বাড়ি। কী বিশাল ধূপখোলা মাঠ। দীননাথ সেন রোডে চমৎকার একটি পাঠাগার। নাম হচ্ছে 'সীমান্ত গ্রন্থাগার'। দুপুরের পর থেকে কত পড়ুয়া মানুষ গিয়ে ভিড় করত পাঠাগারে। কেউ খবরের কাগজ পড়ছেন, কেউ কলকাতা থেকে প্রকাশিত দেশ পত্রিকা, উল্টোরথ, প্রসাদ, জলসা, ঘরোয়া এসব পত্রিকা পড়ছেন। কেউ পড়ছেন বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। দুই খণ্ডের সেই উপন্যাস এত বড়, এত ভারী, রসিকজনেরা ঠাট্টা করে বলতেন, **'কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম'**।

দীননাথ সেন রোডে আমার মায়ের মামাবাড়ি। মায়ের মামা বনেদি ধরনের সংস্কৃতিমনা মানুষ। নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করতেন। বাড়িতে হারমোনিয়াম ছিল, গ্রামোফোন ছিল। গ্রামোফোনকে আমরা বলতাম 'কলের গান'। কলের গানে হেমন্ত সন্ধ্যার গান শুনে আমার মামা-খালারা বড় হয়েছেন। সেই বাড়িতে দেখেছি চমৎকার একটি বইয়ের আলমারি। জগন্নাথ কলেজে পড়তেন আমার কোনো কোনো মামা। কলেজ থেকে ফেরার সময় বাংলাবাজার থেকে উপন্যাস কিনে আনতেন। এক বই ভাগ করে পড়তেন সব ভাইবোন। স্কুলে পড়ার সময় মিনুখালার জন্য একদিন দুদিন পর পরই সীমান্ত গ্রন্থাগার থেকে বই এনে দিতাম আমি। তিনি ছিলেন সীমান্ত গ্রন্থাগারের মেম্বার। বাংলাবাজার থেকেও তাঁকে অনেক বই কিনে এনে দিয়েছি। সেইসব বই পড়ে আলমারিতে সাজিয়ে রাখতেন খালা। এবাড়ি-ওবাড়ি চালাচালি হতো বই। এর বই ও পড়েছে, ওর বই সে। কে কোন বই পড়েছে বা পড়ছে ওই নিয়ে আলোচনা হতো। বইয়ের আলোচনায় কেটে যেত বিকেল, সন্ধ্যা।

দিনে দিনে কখন কোন ফাঁকে কেমন করে যেন আমাদের বাড়িঘর থেকে নিঃশব্দে উধাও হয়ে গেল বইয়ের আলমারিগুলো। বইয়ের আলমারির জায়গাটি দখল করল টেলিভিশন। বই না পড়ে আমরা ঝুঁকে গেলাম টেলিভিশনের দিকে। তারপর এল কম্পিউটার, মোবাইল ফোন। পৃথিবী বদলে গেল। বই ঢুকে গেল টেলিভিশনে, বই ঢুকে গেল কম্পিউটারে। মোবাইল ফোন শিখাল মিথ্যা বলতে।

ষাটের দশকে যেমন ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো, স্বাধীনতার পরও বেশ কতগুলো বছর তেমনই ছিল পরিবারগুলোর চেহারা। বদলটা হলো ধীরে ধীরে। মানুষের হাত থেকে বই অনেকটাই দূরে সরে গেল, বইয়ের আলমারি নামের সবচাইতে মূল্যবান আসবাবটি উধাও হয়ে গেল।

কেউ কেউ বলেন, আলমারি উধাও হলে কী হবে, বই তো লোকে পড়ছে। বাড়িতে আলমারি নেই কিন্তু বই তো আছে। বইয়ের প্রকাশক, দোকান, ক্রেতা, পাঠক সবই তো বেড়েছে। না হলে বাংলা একাডেমীর মাত্র এক মাসের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বিশ-একুশ কোটি টাকার দেশিয় লেখকদের বই বিক্রি হয় কী করে?

পনেরো কোটি লোকের দেশে এই বই বিক্রি কি আসলে কোনো বিক্রি? বাংলাদেশে এখন কত পার্সেন্ট লোক শিক্ষিত? সেই শিক্ষিতজনের কত পার্সেন্ট বই কিনছেন, বই পড়ছেন? এক-দুই পার্সেন্টও যদি হতো, তাহলে তো আমাদের দেশের কোনো কোনো লেখকের বই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হতো! তা তো হয় না। দেশের জনপ্রিয় লেখক ভদ্রলোকের বইও তো কয়েকশো হাজারের চল্লিশেকের ওপর বিক্রি হয় না বছরে! বেশির ভাগ লেখকের বই ছাপা হয় ৫০০ কপি।

অনেকে বলেন, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি কারণে আমাদের পড়ার অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর যেসব দেশে টেলিভিশন অনেক আগে এসেছে, পঞ্চাশ-একশোটা চ্যানেল কোনো কোনো দেশে, কই সেই সব দেশে তো লোকের পড়ার অভ্যাস নষ্ট হয়নি।